মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার: সম্ভাবনা ও অভিজ্ঞতা

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 13 September 2026, 10:53 AM | বিভাগ: ফিচার

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে বাংলাদেশে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে সীমিতসংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সিকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, মাত্র ২৫টি এজেন্সিকে কেন্দ্র করে আবারও একটি সীমিত নিয়োগব্যবস্থা বা তথাকথিত সিন্ডিকেট গড়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে একজন কর্মীর মালয়েশিয়া যেতে ছয় থেকে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হওয়ার আশঙ্কার কথাও বলা হচ্ছে। এসব অভিযোগের সত্যতা ও বাস্তব পরিস্থিতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাই হওয়া প্রয়োজন। তবে একটি বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হওয়ার শিক্ষা দেয়।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আমার কাছে শুধু সাম্প্রতিক সংবাদ বা রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়। প্রায় তিন দশক ধরে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন, রেমিট্যান্স এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় শ্রম অভিবাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি এই বাজারের সম্ভাবনা যেমন দেখেছি, তেমনি এর কাঠামোগত দুর্বলতাও প্রত্যক্ষ করেছি। আমার গবেষণার একটি বড় অংশই ছিল বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় অদক্ষ ও স্বল্পমেয়াদি শ্রম অভিবাসন, অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যয় ও ঝুঁকি,

পরিবারে এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং রেমিট্যান্সের গতিপ্রকৃতি নিয়ে। এই দীর্ঘ গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার কাছে একটি বিষয় ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজারের মূল সংকট বাজারের অভাব নয়; সংকট হচ্ছে বাজার ব্যবস্থাপনায়।

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের মধ্যে একটি স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিপূরকতা রয়েছে। বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বিপুল। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন, যাঁদের সবার জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা কঠিন। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে এমন অনেক খাতে শ্রমিকের চাহিদা তৈরি হয়েছে, যেখানে স্থানীয় কর্মীদের আগ্রহ তুলনামূলক কম। বিশেষ করে নির্মাণ, প্ল্যান্টেশন, কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিচ্ছন্নতা এবং বিভিন্ন শ্রমঘন সেবাখাতে বিদেশি কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। শ্রম অর্থনীতিতে এসব কাজের একটি অংশকে প্রায়ই থ্রি-ডি জবস, যথা ডার্টি, ডেঞ্জারাস এবং ডিফিকাল্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২০১৫ সালে প্রকাশিত আমার একটি গবেষণায় আমরা এই বাস্তবতাকে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে শ্রম অভিবাসন-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে দেখেছিলাম। বাংলাদেশের রয়েছে শ্রম উদ্বৃত্ত এবং মালয়েশিয়ার রয়েছে নির্দিষ্ট খাতে সাধারণ শ্রম ঘাটতি। অর্থনৈতিকভাবে এই দুই অবস্থার সমন্বয় উভয় দেশের জন্যই লাভজনক হতে পারে। মালয়েশিয়া পায় প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি, বাংলাদেশ পায় কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা এবং একজন অভিবাসী কর্মীর পরিবার পায় আয় ও জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ। কিন্তু এই সহজ অর্থনৈতিক সমীকরণের মাঝখানে যখন অস্বাভাবিক অভিবাসন ব্যয়, মধ্যস্বত্বভোগী, অস্বচ্ছ নিয়োগপ্রক্রিয়া এবং সীমিতসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়, তখন সম্ভাব্য লাভের একটি বড় অংশ কর্মীর কাছে পৌঁছায় না।

আমাদের শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনায় প্রায়ই বলা হয়, বছরে কত লাখ কর্মী বিদেশে গেলেন। কিন্তু সংখ্যাটি একা শ্রম অভিবাসনের সাফল্য প্রকাশ করে না। ধরা যাক, একজন কর্মী মালয়েশিয়া যেতে ছয় লাখ টাকা ব্যয় করলেন। এই অর্থের বড় অংশ যদি তিনি জমি বিক্রি করে, আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার নিয়ে কিংবা উচ্চ সুদে ঋণ করে সংগ্রহ করেন তাহলে মালয়েশিয়ায় পৌঁছানোর মুহূর্তেই তিনি কয়েক লাখ টাকার দায় নিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করছেন। প্রথম কয়েক মাস বা বছর তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে ঋণ পরিশোধ করা। ফলে বিদেশে তাঁর প্রকৃত সঞ্চয় কত হচ্ছে, পরিবারের জীবনমান কতটা উন্নত হচ্ছে কিংবা তিনি দেশে ফিরে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করতে পারবেন কি না-এসব প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গায় অভিবাসন খরচকে একটি সাধারণ প্রশাসনিক বিষয় হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি শ্রম অভিবাসনের বিনিয়োগের ওপর রিটার্ন নির্ধারণ করে।

একজন কর্মী যদি তিন লাখ টাকা খরচ করে একই চাকরিতে যেতে পারেন, তাহলে ছয় লাখ টাকা খরচ করা

কর্মীর তুলনায় তাঁর অভিবাসনের অর্থনৈতিক লাভ অনেক বেশি হবে। অথচ দুজনই সরকারি পরিসংখ্যানে একজন করে বিদেশগামী কর্মী। এ কারণে শুধু কতজন কর্মী বিদেশে পাঠানো হলো তা দিয়ে সাফল্য বিচার না করে দেখতে হবে প্রতি কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কত, প্রকৃত আয় কত, ঋণ পরিশোধে কত সময় লাগছে এবং শেষে পর্যন্ত পরিবারে কত টাকা পৌঁছাচ্ছে। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী ও রেমিট্যান্স নিয়ে আমাদের গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছিল। অভিবাসী জনসংখ্যা বাড়লে একই অনুপাতে মাথাপিছু প্রবাসী আয় বাড়বে-বাস্তবে এমন সরল সম্পর্ক সবসময় পাওয়া যায় না।

২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছিলাম, বিভিন্ন হিসাবের ভিত্তিতে অভিবাসী জনসংখ্যার পরিবর্তনের তুলনায় মাথাপিছু প্রবাসী আয়ের পরিবর্তন অনেক বেশি ছিল। এই অস্বাভাবিক পার্থক্যই আমাদের নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত অভিবাসী জনসংখ্যা এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স দুটিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এক দশক পরও প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের লক্ষ্য কি শুধু বেশি কর্মী পাঠানো, নাকি প্রত্যেক কর্মীর উৎপাদনশীলতা ও আয় বাড়ানো? আমার মতে, দ্বিতীয়টিই ভবিষ্যৎ নীতির ভিত্তি হওয়া উচিত।

বর্তমানে সীমিতসংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেটিকে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে দেখলে সমস্যাটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব উপেক্ষিত হবে। কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা অবশ্যই যথাযথ তদন্তের বিষয়। কিন্তু অর্থনীতির দৃষ্টিতে প্রশ্নটি অনেক সহজ, বাজারে প্রতিযোগিতা সীমিত হলে অভিবাসন ব্যয় বাড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয় কি না?

সাধারণভাবে কোনো সেবাবাজারে সরবরাহকারীর সংখ্যা কৃত্রিমভাবে সীমিত হলে প্রতিযোগিতা কমতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক শ্রম নিয়োগ সাধারণ বাজার নয়; এখানে অভিবাসী গ্রহণকারী দেশের নিরাপত্তা, আইন ও বিধিবিধান পরিপালন, নিয়োগকর্তা যাচাইকরণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনার মতো বিষয় রয়েছে। তাই সব লাইসেন্সধারী এজেন্সিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমতি দেওয়াও একমাত্র সমাধান নয়।

কেন ২৫টি প্রতিষ্ঠান? যদি ২৫টিই প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা কোন প্রকাশ্য মানদণ্ডে নির্বাচিত হয়েছে? তাদের অতীত কর্মদক্ষতা কী? কর্মীর অভিযোগ নিষ্পত্তির রেকর্ড কেমন? অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে তাদের সক্ষমতা কী? আবার যদি আরও ১০০টি প্রতিষ্ঠান একই মানদণ্ড পূরণ করতে পারে, তাহলে তাদের বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা কী? এই প্রশ্নগুলোর স্বচ্ছ উত্তরই সিন্ডিকেট বিতর্কের সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হতে পারে।

বাংলাদেশে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা অনেক। কিন্তু শুধু লাইসেন্স থাকাই আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর একমাত্র যোগ্যতা হতে পারে না। আমি বরং একটি কর্মদক্ষতা ও ফলাফলভিত্তিক উন্মুক্ত স্বীকৃতি ব্যবস্থার কথা বলব। যে রিক্রুটিং এজেন্সি নির্ধারিত আর্থিক

সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, নৈতিক নিয়োগনীতি, কর্মীর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং মালয়েশিয়ান নিয়োগকর্তার সঙ্গে যাচাইযোগ্য সম্পর্কের মানদণ্ড পূরণ করবে, তাকে বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তারপর নিয়মিত কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন স্কোর প্রকাশ করা যেতে পারে। কোন এজেন্সির মাধ্যমে কতজন কর্মী গেছেন, কর্মীর গড় অভিবাসন ব্যয় কত ছিল, কতজন প্রতিশ্রুত চাকরি পেয়েছেন, কত অভিযোগ হয়েছে এবং কতগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে এসব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব। তাহলে একজন কর্মী নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাবেন। ভিসা আছে, চাকরি পরে হবে এই ধারণা বন্ধ করতে হবে।

অতীত অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক হচ্ছে বিদেশে পৌঁছানোর পর কর্মীর চাকরি না পাওয়া কিংবা প্রতিশ্রুত কাজের পরিবর্তে অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়া। একজন সাধারণ বাংলাদেশি কর্মীর জন্য বিদেশযাত্রা কোনো পর্যটন নয়। তাঁর পেছনে থাকে একটি পরিবারের কয়েক বছরের সঞ্চয়, কখনো জমি বিক্রির টাকা, কখনো ঋণ। তাই একজন কর্মী বিমানে ওঠার আগেই তাঁর জানা উচিত কে তাঁর নিয়োগকর্তা, কোথায় কর্মস্থল, কী কাজ করবেন, মাসিক মূল বেতন কত, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার নিয়ম কী, আবাসন কে দেবে, চুক্তির মেয়াদ কত এবং চাকরি হারালে কী ব্যবস্থা থাকবে। আমাদের নীতি হওয়া উচিত আগে যাচাইকৃত চাকরি, পরে কর্মী। ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে নিয়োগকর্তা যাচাইকরণ কঠিন হওয়ার কথা নয়। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তথ্যব্যবস্থা সংযুক্ত করে প্রতিটি কর্মীর জন্য ডিজিটাল অ্যামপ্লয়মেন্ট রেকর্ড তৈরি করা সম্ভব।

অদক্ষ শ্রমিক নয়, দক্ষ জনশক্তি। মালয়েশিয়ার বাজার নিয়ে আমাদের পুরোনো চিন্তা পরিবর্তন করতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন শ্রমিক পাঠানোকে লক্ষ্য হিসেবে দেখেছি। ভবিষ্যতে লক্ষ্য হওয়া উচিত দক্ষতা পাঠানো। মালয়েশিয়ার অর্থনীতি পরিবর্তিত হচ্ছে। ম্যানুফ্যাকচারিং, ইলেকট্রনিকস, অটোমেশন, লজিস্টিকস, আধুনিক নির্মাণ, হসপিটালিটি এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর সেবার বিস্তার ঘটছে। বাংলাদেশ যদি শুধু সাধারণ শ্রমিক পাঠাতে থাকে, তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের মূল্যশৃঙ্খল এর নিচের স্তরেই থেকে যাব। একই তরুণকে কয়েক মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে মেশিন অপারেটর, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, নির্মাণকাজের কারিগরি কর্মী, মোটরযান কারিগরি কর্মী, পরিচর্যাকর্মী অথবা আতিথেয়তা খাতের কর্মী হিসেবে পাঠানো গেলে তাঁর আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। অর্থাৎ শ্রমবাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রতি কর্মীর বাজারমূল্য বাড়ানো এখন জাতীয় কৌশল হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া শ্রম অভিবাসন নিয়ে আমার গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হলো, বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সাধারণত একজন ব্যক্তির একক সিদ্ধান্ত নয়। এটি একটি পারিবারিক সিদ্ধান্ত। পরিবার অর্থ দেয়, ঝুঁকি নেয়, সম্পদ বিক্রি করে এবং কয়েক বছর অপেক্ষা করে ভবিষ্যৎ লাভের জন্য। আবার সামাজিক নেটওয়ার্ক-আগে থেকে বিদেশে থাকা আত্মীয়, বন্ধু কিংবা পরিচিত ব্যক্তি-কর্মীর

সিদ্ধান্ত ও গন্তব্য নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং একজন কর্মী প্রতারিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি পরিবার। এই কারণেই অভিবাসন শাসনব্যবস্থাকে শুধু বিমানবন্দর পর্যন্ত কর্মী পাঠানোর প্রশাসনিক কার্যক্রম হিসেবে দেখলে চলবে না। প্রাক-অভিবাসন প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বিদেশে কর্মকাল এবং দেশে প্রত্যাবর্তন-পুরো অভিবাসন চক্রকে নীতির আওতায় আনতে হবে।

রেমিট্যান্সের পরবর্তী প্রশ্ন: তারপর কী? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণাতেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রাণশক্তিতে অভিবাসন ও প্রবাসী আয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান উঠে এসেছে। কিন্তু রেমিট্যান্সের পরিমাণই শেষ কথা নয়। একজন কর্মী দশ বছর মালয়েশিয়ায় থেকে দেশে ফিরে যদি আবার বেকার হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর দীর্ঘ অভিবাসন অভিজ্ঞতার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার একটি অংশ অপচয় হয়। তাই কর্মীদের বিদেশে গমনের পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ এর মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা থাকা উচিত-সঞ্চয়, ব্যাংকিং, বৈধ রেমিট্যান্স, বীমা, বিনিয়োগ এবং দেশে ফেরার পর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হওয়ার পরিকল্পনা। তখন একজন অভিবাসী কর্মী শুধু প্রবাসী অর্থ প্রেরণকারী থাকবেন না; তিনি ভবিষ্যতের বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা হতে পারবেন।

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বহুবার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে। বাজার খোলে, বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রস্তুতি নেয়, কোনো অনিয়ম বা নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়, আবার বাজার সংকুচিত বা বন্ধ হয়। এই বিরতিমূলক ও পুনঃচালুকরণ নীতি কারও জন্যই ভালো নয়। দুই দেশের মধ্যে একটি স্থায়ী বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া শ্রমবাজার কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে সরকার, নিয়োগকর্তা, রিক্রুটিং এজেন্সি এবং কর্মীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। প্রতি ছয় মাসে শ্রম চাহিদা, কর্মীর প্রকৃত অভিবাসন ব্যয়, বেতন, অভিযোগ, চাকরিচ্যুতি, অনথিভুক্ত অভিবাসন-অবস্থা এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এর ফলে সমস্যা সংকটে পরিণত হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের জন্য মালয়েশিয়ার গুরুত্ব শুধু কতজন কর্মী সেখানে কাজ করেন, তা দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার বাইরে শ্রমবাজার বৈচিত্র্যকরণের ক্ষেত্রেও মালয়েশিয়া গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের জনশক্তির সংযোগ ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাই মালয়েশিয়ার বাজার নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে স্বল্পমেয়াদি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থের জায়গা থাকা উচিত নয়। একটি রিক্রুটিং এজেন্সি লাভ করবে এটি ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সেই লাভের ভিত্তি যদি হয় একজন দরিদ্র কর্মীর অস্বাভাবিক অভিবাসন ব্যয়, তাহলে ব্যবস্থাটি টেকসই হতে পারে না। সরকারের কাজ ব্যবসা বন্ধ করা নয়; বরং এমন প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা তৈরি করা, যেখানে ভালো ব্যবসা টিকবে এবং শোষণমূলক ব্যবসা বাদ পড়বে।

প্রায় দুই দশক ধরে শ্রম অভিবাসন ও রেমিট্যান্স নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি বারবার একটি বিষয়

উপলব্ধি করছেি, অভিবাসন নিজিে উন্নয়ন নয়; সুশাসিত অভিবাসন উন্নয়নরে শক্তিশালী মাধ্যম। একজন মানুষ বিদেশে গেলেই তাঁর পরিবার ধনী হয়ে যায় না। তাঁর অভিবাসনরে ব্যয়, চাকরির নিশ্চয়তা, আয়, কর্মপরিবেশ, রেমিট্যান্স পাঠানোর পদ্ধতি এবং দেশে ফেরার পর সঞ্চয়রে ব্যবহার সবকিছু মিলিয়েই অভিবাসনরে প্রকৃত অর্থনৈতিক ফলাফল তৈরি হয়। মালয়েশিয়ার বর্তমান শ্রমবাজার নিয়ে তাই বিতর্ককে শুধু ২৫টি এজেন্সি বিনাম অন্য এজেন্সি বিতর্কে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। আমাদের আরও বড় প্রশ্ন করতে হবে আমরা আগামী দশ বছরে মালয়েশিয়ায় কী ধরনরে বাংলাদেশি কর্মী দেখতে চাই? ঋণগ্রস্ত, অদক্ষ এবং কম মজুরির শ্রমিক? নাকি প্রশিক্ষিত, স্বল্প ব্যয়ে অভিবাসিত, আইনি সুরক্ষাপ্রাপ্ত এবং তুলনামূলক উচ্চ আয়রে দক্ষ বাংলাদেশি কর্মী? আমার কাছে উত্তরটি পরিস্কার। বাংলাদেশকে শ্রমশক্তি রপ্তানিকারক দেশ থেকে ধীরে ধীরে দক্ষ মানবসম্পদ সরবরাহকারী দেশ-এ রূপান্তরিত হতে হবে। আর এজন্য মালয়েশিয়া হতে পারে আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাক্ষেত্র।

সাম্প্রতিক বিতর্ক তাই এক অর্থে আমাদের জন্য সুযোগও সৃষ্টি করছে। এখনই সময় নিয়োগব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, অভিবাসন ব্যয় কমানো, প্রতিযোগিতা বাড়ানো, নিয়োগকর্তা যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক করা এবং দক্ষতাভিত্তিক কর্মী পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সাফল্যরে সূচক আর শুধু হওয়া উচিত নয়, “এ বছর কতজন কর্মী পাঠানো হয়েছে?” বরং আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, একজন কর্মী কত টাকা খরচ করে গেলেন, কত আয় করলেন, কত সঞ্চয় করলেন, তাঁর পরিবার কতটা এগোল এবং শেষে পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি তাঁর অভিবাসন থেকে কতটা টেকসই সুবিধা পেল?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ইতিবাচক করতে পারলেই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য শুধু বৈদেশিক কর্মসংস্থানরে একটি গন্তব্য থাকবে না; এটি হয়ে উঠতে পারে মানবস�পদ উন্নয়ন, রেমিট্যান্স, দক্ষতা অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি কার্যকর অংশীদারত্ব। অতীত আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দিয়েছে। এখন প্রয়োজন সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।